

বিজ্ঞানে নারীদের অবদান খালেদা ইয়াসমিন ইতি

মানব সভ্যতার শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত অসংখ্য উত্থান-পতনের ইতিহাস আছে, যার প্রথমটা জুড়ে নারী পুরুষের অবদান ছিল সমান। অনুমান করা হয় আগন্তনের আবিক্ষার বা গার্হিণ্যায়ন করেছে নারী। যদি তা না-ও হয় নারীরাই আগুন ও তাপ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে খাদ্য সংরক্ষণ করতে শিখেছে। নারীদের হাতেই ১৫ থেকে ২০ হাজার বছর আগে কৃষিকাজের সূচনা হয়। সমাজকে মৃৎপাত্র তৈরির রাসায়নিক প্রক্রিয়া, সৃতা কাটার পদার্থবিদ্যা, তাঁতের প্রযুক্তি এবং শন ও তুলার উদ্ভিদবিদ্যার জ্ঞানদানের কৃতিত্ব শুধুমাত্র নারীদের। নারীরাই প্রথম চিকিৎসক, শিল্পী, প্রাকৌশলী। নারীদের বাসস্থান শুধু রঞ্জনশালা ও সেলাইকক্ষ দিয়ে সাজানো ছিল না। নিজ বাসগৃহে তারা তৈরি করেছে বিজ্ঞান গবেষণাগার।

বুঝতে শেখার পর থেকেই কারও কারও মনে এই প্রশ্নটি উদ্ভূত হওয়া স্বাভাবিক: মানব সভ্যতার ইতিহাসে নারীদের সংখ্যা এত নগণ্য কেন? যেভাবেই হোক এক্ষেত্রে আরো অনেক নারীকে খুঁজে পাওয়া যাবে। অথচ ইতিহাসবেতারাই মানব সভ্যতার ইতিহাস লিখতে গিয়ে বার-বার তা এড়িয়ে গিয়েছেন। ইতিহাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য করা গেছে বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র ও চিকিৎসাবিজ্ঞান সর্বত্রই নারীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইতিহাসবিদদের অনিয়ম এবং অবমূল্যায়নের কারণে সভ্যতার ইতিহাসে নারীদের সংখ্যা ক্রমশ কমে এসেছে। তারপরও পুরুষতাত্ত্বিক সমাজের জাল ভেদ করে অনেকে আমাদের সামনে চলে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য

হলেন হাইপেশিয়া, লরা বেসি, সোফিয়া কোভালেভস্ক্যায়া, লাইস মিটনার, যদিও বেশিরভাগ ইতিহাসবিদই যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের অবদানগুলোকে আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে রাখতে। এই কয়েকজন নারী ছাড়াও ক্যারলিন হার্সেল, মেরী এ্যানি ল্যাভিয়েসিয়ের এবং ডি.এন.এ গবেষক রোজালিন ফ্রাঙ্কলিন- এর কথা উল্লেখ করা যায়, যারা তাঁদের পুরুষ সহযোগীদের সাথে একনিষ্ঠিত্বে কাজ করেছেন; অথচ এই সহযোগীরাই এক সময় তাদের অবদানকে ক্রমশ অন্ধকারের দিকে ঢেলে নিয়ে গেছে। তাছাড়া আরো কিছু নারীর কথা উল্লেখ করা যায়, যাদের অবদান সম্পর্কে নামমাত্র তালিকা করা হয়েছে এবং অন্যদের সম্পর্কে আমরা জানতে পেরেছি কেবলমাত্র নিজস্ব কৌতূহল ও আনুসঙ্গিক নির্দেশনার মাধ্যমে। আর নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে অবশিষ্টদের জীবনযাত্রা ও কাজের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা হয়তো ভবিষ্যতেও কিছু জানতে পারবো কিনা সন্দেহ! সর্বোপরি এটাই প্রাতীয়মান হয় যে নারীরা সভ্যতার উষালগ্ন হতে পুরুষশাসিত সমাজের সীমাবদ্ধতায় পথ হারিয়েছে বারবার। তারপরও পুরুষতাত্ত্বিক সমাজের সীমাবদ্ধতাকে পেছনে ফেলে যে সকল নারী বিজ্ঞানের ইতিহাসে আলোকশিখা জ্ঞালিয়েছেন তাদের ১৩৫ জনের নাম আমরা বলতে পারব। হারিয়ে যাওয়া পথের এই সীমাবদ্ধতার মাঝেও যে সকল নারী বিজ্ঞান জগতে এক বিরল দৃষ্টান্ত রেখেছেন তাদের কয়েকজনের কথাই সংক্ষেপে এই নিবন্ধে তুলে ধরা হল।

১. হাইপেশিয়া: (৩৭০ - ৪১৭ সাল)

বিজ্ঞানে নারীদের মধ্যে যে নামটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব নিয়ে উঠে এসেছে, যার মৃত্যুর সাথে জড়িয়ে আছে আলেকজান্দ্রিয়া গ্রান্থাগারের ধ্বংস, যার মৃত্যুর সাথে মধ্যযুগীয় অন্ধকার যুগের সূচনা হয়েছিল, যার নাম মনে আসলে পুরো প্রিন্টাদের আগের ও পরের ইতিহাসের পর্যায়ক্রমিক ধাপগুলো জানতে ইচ্ছা



করে তিনি হলেন হাইপেশিয়া। গণিতবিদ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও দার্শনিক হাইপেশিয়াকে বলা যায় প্রাচীন বিজ্ঞান ও গণিতকে বোঝার একটি দরজা। এই নারী আলেক্সান্দ্রিয়া গ্রাহণারের শেষ প্রাণ-প্রদীপ হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি নাটকও লিখতেন। তিনি ৪০০ অব্দের দিকে নব্য প্লেটেনিক ধারার স্কুলের প্রধান হয়েছিলেন। তিনি খ্রিস্টান ধর্মসহ তখনকার ধর্মগুলো সম্পর্কে অবগত ছিলেন। কিন্তু তা তাকে আকর্ষণ করতে পারে নি। তিনি বলেছিলেন, পরিণত বুদ্ধির জাতির জন্য থাকা উচিত যুক্তিশূন্য জ্ঞানভিত্তিক ধর্ম, যা ছিল গ্রিকদের। আমি আলেক্সান্দ্রিয়ায় বসে থাথাশক্তি কাজ করে যাচ্ছি। ৪১৭ খ্রিস্টাব্দের কোনো এক গোধূলীবেলায় খ্রিস্টান ধর্মান্বরা এই মহীয়সী নারীর শরীর টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে আগুনে পুড়িয়ে নির্মভাবে হত্যা করে। তার দেহ যখন খ্রিস্টান ধর্মান্বরা ছিঁড়িয়ে করছিল তখন একবারের জন্য চঁচিয়ে, কেবল মিনতি করে জীবন ভিক্ষা চেয়ে নিজের মর্যাদা স্ফুরণ করেন নি। যাঁর মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া গ্রাহণারের হাতে লেখা পাঁচ লক্ষ বইয়ের ধ্বংস এবং সেইসাথে সূচনা হয় মধ্যযুগীয় অন্ধকারের।

২. সোফি জার্মেইন: (১৭৭৬ সালের ১ এপ্রিল - ১৮৩১ সালের ২৭ জুন) অস্থাদশ শতাব্দীর এক অগ্রিমতাবোধী নারী ছিলেন গণিতবিদ সোফি জার্মেইন-বাঁচার জন্ম ফরাসী বিপ্লবের সময়, ফ্রাঙ্গের প্যারিসে। তাঁর বাবার নাম ছিল এম্ব্ৰোইজ-ফ্রানকোইস এবং মায়ের নাম ছিল মেরি জার্মেইন (Marie Germain) একজন বিপ্লবী সৈনিকের মতো, তাঁর জীবনও কেটেছে অনেক



অধ্যবসায় এবং কঠোর পরিশ্রমে। মাত্র ১৩ বছর বয়স থেকেই গণিতের প্রতি তাঁর আগ্রহ দেখা দেয়। রোমান সৈনিকের হাতে মহাগণিতজ্ঞ আকিমিডিসের মৃত্যুর কাহিনী পড়েই এ আগ্রহের সূচনা হয়। এ ঘটনা যেন সোফির কৌতুহলকে স্ফুলিঙ্গায়িত করে তোলে। তিনি শুধু বিশ্বের প্রশ্ন করেন, গণিতিক সমস্যায় আত্মগুণ থাকা একজন গণিতজ্ঞ কোন সৈন্যের প্রশ্নের উত্তর

দিতে ব্যর্থ হলে মৃত্যুবরণ করতে হয়! গণিতে তাঁর অবদানের মূল্যায়ন পেতে সোফি'কে জীবনের অনেকটা সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে। এমনকি আজও এটা মনে করা হয় যে তিনি যে পরিমাণ অবদান রেখেছেন সংখ্যাতত্ত্ব এবং গাণিতিক পদার্থবিদ্যায় তার কোন কৃতিত্বই তাঁকে দেওয়া হয় নি শুধুমাত্র একজন নারী হওয়ার কারণে।

বাবা-মা মনে করতেন যে, একজন নারী হিসেবে সোফির গণিতের আগ্রহ অনুপযুক্ত, যদিও মা-বাবার নজর এড়িয়ে গভীর রাতে তিনি পড়াশুনা শুরু করতেন। কিন্তু একদিন মা-বাবা দেখলেন বিছানায় রাতের পোশাকে নিজেকে প্রচঙ্গ শীতের মাঝেও তাপ ও আলো থেকে বর্ষিত করে গভীর রাতে একটানা পড়াশুনা করে যাচ্ছেন। শিক্ষকের সহায়তা ছাড়াই ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাসের মতো গণিত শিখেছিলেন। সামাজিক কারণে ছেলেদের ছদ্মনামে বিখ্যাত গণিতবিদ ও পদার্থবিজ্ঞানী: জে.এল.ল্যাগরেঞ্জ, কার্ল ফ্রেডারিক গাউস, লিজেন্ডার-জোসেফ ফুরিয়ারের যোগাযোগ গড়ে তোলেন এবং নিজের দক্ষতা প্রমাণ করেন। সোফিকে মূলত স্মরণ করা হয় তাঁর সংখ্যাতত্ত্বের জন্য, কিন্তু স্থিতিস্থাপকতা সূত্রের ক্ষেত্রেও গণিতে তাঁর অবদান যথেষ্ট গুরুত্বহীন। ১৮৩১ সালে গণিতবিদ গস এর সুপারিশের ফলে গোয়েটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয় তাকে প্রথম ডক্টরেট ডিপ্রি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে তার আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

৩. প্রথম ফসিল অনুসন্ধানকারী মেরি অ্যানিং: (১৭৯৯ সালের ২১ মে - ১৮৪৭ সালের ৯ মার্চ): মেরি অ্যানিংকে প্রথম ফসিল অনুসন্ধানকারীও বলা যায়। তাঁর জন্ম ও মৃত্যু ইংল্যান্ডের লাইম রিজিসে। তিনি সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন বড় মাপের একজন জীবাশ্ম বিশেষজ্ঞ হওয়ার জন্য। লন্ডনের জিওলজিক্যাল সোসাইটি কর্তৃক Ichthyosaurus এর



একটি অনুসন্ধানের জন্য অ্যানিংকে একটি বিশেষ স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তিনি উড়ন্ত সরিস্প জাতীয় প্রাণীর জীবাশ্ম আবিষ্কার করেছিলেন। অ্যানিং বাবার কাছ থেকে ফসিল অনুসন্ধান ও উত্তোলনের পদ্ধতি সম্পর্কিত শিক্ষা নিয়েছিলেন।

১১ বছর বয়সে একদিন তিনি সমতল পাথরে ঢাকা একটি স্থানকে সন্দেহ পোষণ করায় তাকে হ্যামার দিয়ে খনন শুরু করেন। কয়েক সপ্তাহ চেষ্টার পর ৪ ফুট লম্বা একটি মুখমণ্ডল বের হয়। তার ভাই এটাকে সামুদ্রিক ড্রাগন নামে অভিহিত করেন।

১৮৩২ সালে বিখ্যাত প্রত্নজীবাশ্মবিদ জিডিওন মানটেল, যাঁকে সবচেয়ে প্রাচীন ডাইনোসরের ফসিল সন্তুষ্টকরণের জন্য কৃতিত্ব দেওয়া হয়, তিনি মেরির নামের শুরুতে যুক্ত করেছিলেন সিংহী ভূ-তাত্ত্বিক মেরি অ্যানিং। খ্যাতনামা এক জার্মান পরিকল্পনবিদ লডউইগ লাইচার্ড মেরিকে ডাকতেন প্রত্নজীবাশ্মবিদ রাজকন্যা বলে। মেরি অ্যানিং আসলে জীবদ্ধশায় যা করেছিলেন তাই তাঁকে এত বিখ্যাত করেছে, করেছে প্রাচুর্যময়। অ্যানিং শৈশবে সমুদ্রের সৈকতে আপন মনে ঘুরে বেড়াতেন এবং নিষ্ঠা আর আন্তরিকতায় বিভিন্ন ধরনের প্রাণীর নতুন জীবাশ্ম নমুনা খুঁজতেন। তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা খুব কম থাকলেও প্রত্নজীবাশ্মবিদ্যায় তিনি বিশাল অবদান রেখে গিয়েছেন। তাঁর নিজস্ব প্রকাশিত একটি প্রত্নজীবাশ্মবিদ্যাভিত্তিক প্রকাশনাও ছিল।

৪. মাদাম মেরি কুরী (১৮৬৭ সালের ৭ নভেম্বর - ১৯৩৪ সালের ৪ জুলাই)

তিনিই একমাত্র নারী যিনি দুবার দুবিষয়ে (পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন) মোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। আজীবন তেজস্ক্রিয়



পদার্থ নিয়ে কাজ করে এক অজানা রোগে মৃত্যুবরণ করেন।

তার মৃত্যুর পর আইনস্টাইন বলেছিলেন, “সুপ্রসিদ্ধ মনীষীদের মাঝে একমাত্র মেরি কুরীর জীবনই যশের প্রভাবমুক্ত ছিল।

নিজের জীবনটা যিনি অপরিচিতের মতো সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে পেরিয়ে গিয়েছেন, সেই চিরকেলে নারীর কথা লিখতে বসে আজ আমি নিজের মধ্যে সাহিত্য প্রতিভার অভাব বোধ করছি।” মেরি স্কলোডসকা কুরীর জন্য রাশিয়ার অত্যাচারী জার শাসনে নিষ্পেষিত পোল্যান্ডের ওয়ার্শ-এ। পরিবারে তাঁকে মানিয়া নামে ডাকতো। তাঁর বাবা ব্লাদিস্তাভ শক্রোভোক্সি ওয়ার্সে একটি নামকরা কলেজের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন এবং মা ছিলেন একটি নামকরা স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। তাঁর বাবা প্রতি শনিবার সন্ধিয়ায় মেরির পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ে আসর বসাতেন।

একসময় তাঁর পরিবার মারাঞ্জক অর্থ সংকটে পড়ায় তাঁর বড় বোনের পড়াশুনার খরচ চালানোর জন্য তিনি ১৮৬৬ সালের ১ জানুয়ারি মাসিক পাঁচশ রুবল-এর বিনিময়ে এক অভিজাত রশ আইনজীবীর বাড়িতে গভর্নেন্সের চাকরি নেন। তাদের দুর্বোনের মধ্যে শর্ত ছিল একজনের পড়াশুনা শেষ হবার পর অপর জনের পড়াশুনা শুরু হবে এবং একজন অপরজনের পড়ার খরচ যোগাবে। তাই অনেক মাসিক পীড়নের মধ্যে তাঁকে তিনি বছর চাকরি করতে হয় এবং এরই মধ্যে তার বড় বোন ব্রানিয়া ডাক্তারি পাস করে। পূর্ব শর্তানুযায়ী এবার মেরি তাঁর বোনের আর্থিক সহায়তায় বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষার জন্য প্রথমে অস্ট্রিয়ার শাসনাধীন ক্রাকো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান। কিন্তু সেখানে তিনি বিজ্ঞান ক্লাসে যোগ দিতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সচিব তাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে বলেন “বিজ্ঞান মেয়েদের জন্য নয় তাই তিনি যেন রংধন শিক্ষা ক্লাসে যোগ দেন।” পরে ভর্তি হন ফ্রান্সের সরবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে শিক্ষক হিসেবে পান এক ফরাসী বিজ্ঞানী পিয়ারে কুরীকে, যিনি ইতিমধ্যে চৃক্ষক ও পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মৌলিক গবেষণা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। পিয়ারে কুরী তার জীবনকে পরিবর্তিত করার ক্ষেত্রে নিয়ামক ভূমিকা রাখেন। তারা বিয়েও করেন। ১৮৯৮ সালেই এই দম্পত্তি প্রথমে পিচঁড়েও হতে তেজস্ক্রিয় পদার্থ পলোনিয়াম (94Pu239) এবং পরে রেডিয়াম (Ra) আবিষ্কার করেন যা ইউরোনিয়াম [92U239] হতে দশ লক্ষণে বেশি শক্তিশালী। এই রেডিয়ামের ব্যবহার অপরিসীম। তাদের কাজের অবদান স্বরূপ ১৯০৩ সালে লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটি কুরী দম্পত্তিকে ডেভিড পদক প্রদান করে। এবং এ বছরই পদার্থবিজ্ঞানে হ্যানরি বেকেরেলের সাথে তাদেরকে মোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

তিনি রেডিয়ামকে বিশুদ্ধ অবস্থায় আলাদা করতে সক্ষম হন। এবং পুনরায় তাঁর যোগ্যতা প্রমাণে সক্ষম হন। তার এই কৃতিত্বের জন্য ১৯১১ সালে রসায়ন বিজ্ঞানে তিনি একা মোবেল পুরস্কার পান। দ্বিতীয় যুদ্ধে আহত সৈনিকদের দিয়েছেন একগু সেবা, ভবিষ্যত বিজ্ঞানীদের দিয়েছেন উপদেশ ও পরামর্শ। সর্বেপরি নিজের স্বাস্থ্যের দিকে না তাকিয়ে তিনি চেলে দিয়েছেন তাঁর সবচেয়ে সময়।

৫. লাইস মিটনার: (১৮৭৮ সালের ৭ নভেম্বর - ১৯৬৮ সালের ২৭ অক্টোবর)

পরমাণু বা নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞানী এই নারী ছিলেন এমন একজন বিজ্ঞানী যিনি কখনো মানবিকতাকে হারান নি। যাকে



এমিল ফিশার ইনসিটিউটে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় নি। তিনি একজন অপুরণ্পা নারী তাই অন্যবিজ্ঞানীদের কাজে মনোযোগ নষ্ট হবে বলে। তাঁকে নোবেল পুরস্কার থেকেও বাস্থিত করা হয়েছিল তাঁরই ৩০ বছরের সহযোগী অটোহ্যানের কৌশলগত কারণে। অথচ ফিশার বিজ্ঞানার তিনিই পথিকৃত বা ব্যাখ্যাদাতা। তাকে বলা হতো “এটম বোমা তৈরির ইহুদী-মাতা, অথচ তিনি পরমাণু বোমা তৈরির কাজ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সবকিছু মিলিয়ে তিনি ছিলেন বিজ্ঞান জগতের এক কিংবদন্তীর নায়িকা।

তাঁর গবেষণার একটি বিষয় ছিল ‘মহাজাগতিক প্রক্রিয়ার (cosmic process) ক্ষেত্রে তেজক্রিয়ার তাৎপর্য’। এ ঘটনাটি এই স্মরণ করিয়ে দেয় যে এ যেন পুরুষশাষ্টি সমাজের দীর্ঘ ধারাবাহিকতার ফল যে ধারাবাহিকতা একজন সৃষ্টিশীল নারীর প্রতিভাকে এমন নির্মমভাবে পরিহাস করতে শিথিয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) আগ পর্যন্ত আমেরিকাতে তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। এই নারীকে নাস্তীদের জন্য রিক্ত হাতে জার্মানি থেকে পালাতে হয়েছিল। পলায়নের পর স্টোকহোম থেকে মিটনার চিঠিতে লিখেছিলেন: নিজেকে আমার বাড়ে উল্লে যাওয়া পুতুলের মতো মনে হয়। স্বয়ংক্রিয়ভাবে কিছু ঘটনা আমাদের সাথে বন্ধসুলভ ভাব প্রকাশ করে কিন্তু তার কোনো নিজস্ব স্বকীয়তা নেই। এ থেকেই পুরস্কার হয়ে যায় তিনি জীবনের বেশিরভাগ সময় কর্তৃত নির্মমভাবে কাটিয়েছেন।

৬. এমি নোয়েথার: (১৮৮২ সালের ২৩ মার্চ- ১৯৩৫ সালের ১৪ এপ্রিল)

এমির জন্য জার্মানীর এরল্যাঙ্গেন-এ; মৃত্যু ব্রাইন মাউর পেনসিলভেনিয়া। নোয়েথারের জীবনালেখ্য অক্ষিত ছিল গাণিতিক মহত্ব দ্বারা। জার্মানির গোয়েটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে

থাকাকালীন আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের উপর তিনি যে কাজ করেন তা এখনও নোয়েথারের তত্ত্ব নামে পরিচিত। তিনি গোয়েটিংগেনে দীর্ঘদিন বিনা বেতনে সহযোগী অধ্যাপনার কাজ করেন শুধুমাত্র একজন নারী ছিলেন বলে। এরপর ১৯০৭ সালে তিনি গণিতে পি.এইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন।



নোয়েথার ১৯০৮ থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত কোন ধরনের অর্থ এবং পদবী ছাড়াই এরল্যাঙ্গেনের একটি গণিত ইনসিটিউটে কাজ করেন। অথচ সেই সময় তিনি আর্নস্ট অটো ফিশার - এর মতো বীজগণিতবিদের সহযোগী হিসেবে ছিলেন এবং আরাস্ত করেক্স ক্লেইন এবং ডেভিদ হিলবাট্রের সঙ্গেও তিনি কাজ করেছিলেন। ১৯১৫ সালে তিনি গটিনজেনের গণিত ন সাধারণ, তাত্ত্বিক বীজগণিতের উপর গবেষণা। যার জন্য পরবর্তীতে তিনি স্বীকৃত পেয়েছিলেন। বিখ্যাত গণিতবিদ হারম্যান মিনকোভস্কি, ফেলি ইনিস্টিউটে নিয়োগ প্রাপ্ত হন এবং ক্লেইন ও হিলবাট্রের সাথে আলবার্ট আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব নিয়ে কাজ শুরু করেন। ১৯১৮ সালে তিনি দুটো উপপাদ্য প্রমাণ করেন যা সাধারণ আপেক্ষিকতা এবং মৌলিক কণা-পদার্থবিজ্ঞানের মূল বিষয় ছিল। যেগুলোর একটি এখনও নোয়েথারের উপপাদ্য নামে পরিচিত।

কিন্তু তখন পর্যন্ত তিনি লিঙ্গ-বৈষম্যের কারণে গোয়েটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত হতে পারেন নি। তার দোষ তিনি নারী ছিলেন। তবে হিলবার্ট-এর সহকারি হিসেবে তাকে বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। হিলবার্ট এবং আলবার্ট আইনস্টাইন তাঁর পক্ষে সুপারিশ করলে ১৯১৯ সালে তিনি বক্তৃতা দেওয়ার অনুমতি অর্জনে সক্ষম হন যদিও তখন পর্যন্ত তা বিনা বেতনে ছিল। তাঁর গাণিতিক কাজগুলো পদার্থবিদ ও কেলাসতত্ত্ববিদের খুবই ব্যবহারোপযোগী ছিল। ১৯২৮ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত একজন পরিদর্শনকারী অধ্যাপক হিসেবে মক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কাজ করেন। ১৯৩০ সালে ফ্রান্কফুর্টে শিক্ষকতা করেন। ১৯৩২ সালে জুরিখে আন্তর্জাতিক গণিত কংগ্রেসে একটি পূর্ণাঙ্গ বক্তৃতা দেন। একই বছর তাঁকে গণিতের উপর একটি সম্মানজনক পুরস্কার ‘একারম্যান-

চিউনার মেমোরিয়াল পুরস্কার প্রদান করা হয়।

৭. রজার আরলিনার ইয়ং (১৮৯৯ সাল - ১৯৬৪ সাল)

প্রথম আমেরিকান যিনি প্রাণিবিদ্যায় ডষ্ট্রেট ডিপ্রি লাভ করেছিলেন। এই প্রাণিবিদকে সারাজীবনই সংগ্রাম করতে হয়েছে। তার পঞ্চ মায়ের সেবার পাশাপাশি নিরলসভাবে তিনি গবেষণা ও শিক্ষার কাজ করে গেছেন। তার জীবন কাহিনী হলো দৃঢ় চরিত্র ও অধ্যবসায়ের একটি গল্প। তিনি বড়ে হন পেনসিলভেনিয়ার বারগেটস্টার্টনে। হাউয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণী বিজ্ঞান বিভাগের আর্নেস্ট এভারেট জাস্ট -এর অধীনে তার প্রথম বিজ্ঞান কোর্স শুরু করেন। গ্রেড কম হলেও তার মধ্যে জাস্ট সন্তানো দেখতে পান। জাস্ট তাকে গবেষণা করার জন্য ১৯২৭ সালে ম্যাসিচুরেটস-এ মেরিন



বায়োলজিক্যাল ল্যাবরেটরিতে আমন্ত্রণ জানান। তারা সামুদ্রিক প্রাণির প্রজনন প্রক্রিয়া এবং হাইড্রেশন- ডিহাইড্রেশনের উপরও গবেষণা করেন। এ ব্যাপরে এতই দক্ষতা অর্জন করেছিলেন যে জাস্ট তাকে প্রাণিবিজ্ঞানের একজন সত্যিকারে প্রতিভা বলে চিহ্নিত করেন। পরবর্তী সময়ে জাস্ট এর সঙ্গে তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তিনি মারা যান দরিদ্র ও নিঃসঙ্গ অবস্থায়।

৮. রোজলিন ফ্রাঙ্কলিন (১৯২০ সালের ২৫ জুলাই - ১৯৫৮ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি)

তিনি লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেন, একটি স্বচ্ছ ইহুদি পরিবারের মেয়ে রোজলিন ফ্রাঙ্কলিন ছিলেন একজন অগুজীববিজ্ঞানী এবং ভৌত রসায়নবিদ যাঁকে সবচেয়ে ভালভাবে স্মরণ করা হয় কয়লা, ডি.এন.এ এবং উক্সিদ ভাইরাস সংক্রান্ত গবেষণায় তাঁর বিশেষ অবদানের জন্য। তার মতো আর কোনো নারী-বিজ্ঞানীর জীবন এতটা বিতর্কিত এবং কর্মসূর্খের ছিল না। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে তিনি ফ্রাসের প্যারিসে একটি গবেষণাগারে কাজ করেন। এখানেই তিনি রঞ্জনরশ্মি বিচ্ছিন্নকরণ কোশল শিখেছিলেন, গবেষণা করেছিলেন



কেলাসত্ত্ববিদ জ্যাকস মিরিং -এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে। খুব সাধারণ কিছু সরঞ্জাম নিয়ে, ফ্রাঙ্কলিন ডিএনএ-এর একক তত্ত্ব উচ্চ বিশ্লেষণীয় ফটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন।

রোজালিন ফ্রাঙ্কলিন-এর এই কেলাস সম্পর্কিত কাজ ওয়াটসন, ক্রিক ও উইলকিনস কর্তৃক উপস্থাপিত ডাবল হেলিক্স মডেলের পরীক্ষামূলক সমর্থন যুগিয়েছিল। অর্থ জেমস ওয়াটসন, ফ্রানসিস ক্রিক এবং মরিস উইলকিনসকে ডিএনএ-র ডাবল হেলিক্স গঠনের জন্য নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হলেও রোজালিন ফ্রাঙ্কলিনকে এই অমূল্য কাজের জন্য কোনো কৃতিত্বই দেওয়া হয়নি। অবশ্য এর আগে ১৯৫৬ সালের শরতে রোজালিন ফ্রাঙ্কলিন মাত্র ৩৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তাই ডিএনএ-র গঠন কাঠামো আবিষ্কারের গল্পকে এখনও বলা হয় একটি প্রতিযোগিতামূলক ষড়যন্ত্র।

৯. রোজসা পিটার (১৯০৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি- ১৯৭৭ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি)

রিকার্সিভ ফাংশন তত্ত্বের (Recursive function Theory) প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে গণিতবিদ রোজসা পিটার গণিতবিদদের মধ্যে পরিচিত হয়ে আছেন। আধুনিক গণিতে তার বহুবিধ অবদান রয়েছে। নারী হওয়ার কারণে বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যদিয়ে তাকে অর্জন করতে হয়েছে এই স্বীকৃতি। তার জন্ম হাস্পেরির বুদাপেস্টে।

১০ হেলেন সয়ের হগ (১৯০৫ সালের ১ আগস্ট- ১৯৯৩ সালের ২৮)

হেলেন সয়ের হগ ছিলেন এমন একজন নারী যিনি নক্ষত্রের কৌতূহল সবার মধ্যে দেখতে চেয়েছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসেবে তার জীবন অতিবাহিত হয়েছে খুবই উল্লেখযোগ্য কর্ম সম্পাদনের মধ্য দিয়ে। তার গবেষণার বিষয় ছিল বর্তুলাকার নক্ষত্রপুঁজি পরিবর্তনশীল নক্ষত্রের উপর। কিন্তু তাকে সবচেয়ে বেশি স্মরণ করা হবে তার জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক কলামের



জন্য যা তিনি লিখেছেন ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৩০ বছর। তিনি চেয়েছিলেন বিজ্ঞানে নারীদের প্রবেশ এবং এর জন্য উৎসাহ ও সাহস যোগাতেন। ১৯২৬ সালে হারভার্ড অবজারভেটরিতে বিশ্ববিদ্যাত জ্যোতিঃগণ্ডথর্ভিজ্ঞানী হ্যারলো শেপলির সঙ্গে তিনি কাজ করেছেন। তাকে রাতের আকাশের অসাধারণ ক্লান্সিইন পথিক বলা হয়। তিনি ২০০ এর বেশি গবেষণাপত্র তৈরি করেছেন, যেগুলো তাকে দীর্ঘপথে চলতে সহায়তা করেছে। পরবর্তনশীল বা ভেরিয়েবল স্টারের উপর তার তালিকা জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এখনও ব্যবহার করেন। তিনি মিক্ষিওয়ে গ্যালাক্সি থেকে দূরবর্তী গ্যালাক্সিগুলোর মধ্যকার দূরত্ব পরিমাপের নতুন কৌশল আবিষ্কার করেন।

১১. আড়া বায়রন: (১৮১৫ সালের ১০ ডিসেম্বর - ১৮৫২ সালের নভেম্বর):

বিখ্যাত এই মেটাফিজিশিয়ান এবং সায়েন্টিফিক গণনার প্রতিষ্ঠাতা ইংল্যান্ডের লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ওয়ানেই তার মৃত্যু হয়। আড়া বায়রন ছিলেন রোমান্টিক কবি লর্ড বায়রন ও অ্যানে ইসাবেলে মিলব্যাংকের কন্যা। কিন্তু এই দম্পত্তি অ্যাডার জন্মের ঠিক এক মাস পর পৃথক হয়ে যান। ৪ মাস পর বায়রন চিরকালের জন্য ইংল্যান্ড ছেড়ে যান। অ্যাডা



কখনোই তার বাবার সঙ্গে দেখা করেন নি (১৮২৩ -এ অ্যাডার বাবা গ্রিসে মারা যান)। তার মা লেডি বায়নই তাকে বড়ো করে তোলেন। তার জীবন আবেগ ও যুক্তির, অধ্যাত্মাদ ও বিষয়ামুখিতা, কবিতা ও গণিতশাস্ত্র এবং অসুস্থ স্বাস্থ্য ও শক্তি স্ফুরণের মধ্যকার সংগ্রামে মহিমান্বিত।

লেডি বায়রন কোনোভাবে চাননি তার মেয়ে বাবার মতো কাব্যময় হোক। তিনি চেয়েছিলেন অ্যাডা গণিত ও সঙ্গীত শিক্ষার মধ্যদিয়ে বড়ো হোক যাতে বিপজ্জনক কাব্যিক প্রবণতাকে প্রতিরোধ করা যায়। কিন্তু অ্যাডার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাণ্শ ঐতিহ্য ১৮২৮ সালের প্রথম দিকে প্রতীয়মান হয়েছিল, যখন তিনি ফ্লাইই মেশিনের নকশা প্রণয়ন করেছিলেন। আর গণিতশাস্ত্র তার জীবনকে দিয়েছিল উড়ে চলার গতি।

উল্লেখ্য, আধুনিক কমপিউটারের জনক চার্লস একটি ডিফারেন্সিয়াল যন্ত্র উন্নত করেন। যার উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন সংখ্যার ঘাত গণনা করা অর্থাৎ কোন সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দিয়ে একবার, দুবার, তিনবার চারবার গুণ করলে যে ফল হয় তা বের করা। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যন্ত্র বানানোর সময় আরেকটি নতুন যন্ত্র বানানোর স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন যা তাকে ইতিহাসে অমর করে রেখেছে। এর নাম তিনি দিয়েছিলেন এনালিটিক্যাল ইঞ্জিন বা বিশ্লেষণী যন্ত্র। চার্লস ব্যাবেজের কল্পিত এই যন্ত্রে আধুনিক স্বয়ংক্রিয় কমপিউটারের অনেক গুণই উপস্থিত ছিল। সৌভাগ্যের ব্যাপার ব্যাবেজের অনেক ধারণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বিখ্যাত ইংরেজ কবি কল্যান আড়া বায়রন। অ্যাডা বায়রন লাভলেক এই যন্ত্রের কর্মসূচি বা প্রোগ্রাম করেছিলেন। তাই তাকে প্রথম প্রোগ্রামার বলা হয়।

খালেদা ইয়াসমিন ইতি, মুক্তমনা সাইটে নিয়মিত লিখে থাকেন। ডিক্ষান্দন প্রজেক্টের সাথে যুক্ত